নারীবাদের বক্তব্য বহুমুখী। তার মধ্যে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদের বক্তব্য আমাদের আলোচ্য। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে নারীজাতিকে নানা ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। **প্রথমত,** এই নীতিদর্শন পুরুষের স্বার্থ ও অধিকারকেই নৈতিকভাবে মুখ্য আলোচ্য বলে মনে করেছে। নারীর স্বার্থ বা অধিকার নৈতিকতার আলোচনায় স্থান পায়নি। **দ্বিতীয়ত,** নারীদের তথাকথিত নিজস্ব জগৎ— যে জগতে নারীরা পরিবার প্রতিপালন করে সেই জগতের সমস্ত সমস্যাকে নৈতিকতার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়েছে। **তৃতীয়ত,** এই নীতিদর্শন মনে করে যে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মতো নীতিগতভাবে উন্নত। **চতুর্থত,** এই নীতিদর্শন পুরুষের নৈতিক ধর্মের আলোকে নারীর নৈতিকধর্মের মূল্যায়ন করতে চায়। এখানে মনে করা হয় যে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, বুদ্ধি প্রভৃতি তথাকথিত পুরুষের গুণাবলী শুধু যে পুরুষধর্ম তা নয়, বরং তথাকথিত নারীধর্ম অর্থাৎ আবেগ, পরস্পরনির্ভরতা, শান্তি প্রভৃতির তুলনায় বেশি মূল্যাবান বলে মনে করে। **পঞ্চমত,** পুরুষকল্পিত নৈতিক যুক্তিকে এই নীতিদর্শন শ্রেয় বলে মনে করে কারণ সেখানে সার্বজনীনতা ও ব্যাক্তিসাপেক্ষতা নেই। নারীদের নৈতিক যুক্তিতে আছে সখ্যতা, নিরপেক্ষতা যা পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন।

এই জাতীয় চিন্তাধারায় লিঙ্গসাপেক্ষ নীতিদর্শনের জন্ম হয়। নারীবাদীদের উদ্দেশ্য হল এমন একটি নীতিদর্শন উদ্ভাবন করা যা হবে লিঙ্গনিরপেক্ষ।

নৈতিকতার লৈঙ্গিক চরিত্র এবং নারীবাদী নৈতিকতার ধারণাটি আদৌ আধুনিক ধারণা নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই নারীদের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল: নারীদের বিশেষ ধর্মগুলি কি স্বাভাবিক ধর্ম অথবা সমাজের দ্বারা আরোপিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মেরী ওলস্টোনক্র্যাফট বলেছিলেন যে নারী এবং পুরুষের নৈতিক আদর্শ প্রায় সমান। পুরুষজাতি নারীকে এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রেখেছে যার ফলে

তাদের ক্ষমতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নীতিবোধ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। পুরুষকে যদি সংসারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হত তাহলে পুরুষের মধ্যেও সেই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হত যা নারীসুলভ বলে পরিচিত। সমাজ মানুষকে বিভিন্নভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে।

সমাজ শুধু পুরুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে। নারীকে শিখিয়েছে ভদ্রতা ও সৌজন্য। ওলস্টোনক্র্যাফট মনে করেছেন যে নারীর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য তাদের পুরুষের মতো করে গড়ে তুলতে হবে। নারীরা যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবদমিত হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি পেলেই তাদের মধ্যে সুপ্ত নীতিবোধ জাগ্রত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মিল বলেছিলেন যে নৈতিকতা বা অন্যান্য মূল্যবোধের সঙ্গে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজ নারী ও পুরুষের নৈতিকতাকে একই মানদণ্ডে বিচার করেনি। মিল সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। 'The Subjection of Women' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজই নারীর মধ্যে নানা মহৎগুণ সৃষ্টি করেছে। এই সমাজই নারীকে শিখিয়েছে অপরের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে। নারী শুধু দেওয়ার জন্য জন্ম নিয়েছে, গ্রহণ করার জন্য নয়। সে হবে সমর্পিতা, কষ্টসহিষ্ণু। এই সমস্ত গুণকে সমাজ তার উপর আরোপ করে তাকে মহৎ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

নারীর ধর্ম বা নৈতিক আদর্শ সমাজের দ্বারাই আরোপিত— এই ধারণার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করা যায় না। তবে বিগত শতাব্দীতে আমরা আর একটি ধারণার সাক্ষাৎ পাই। অনেকে মনে করেন যে নারীর নৈতিক মূল্যবোধ পুরুষের মূল্যবোধের তুলনায় উন্নত। তবে সেই ধর্ম বা মূল্যবোধ পুরুষেরও অনুকরণীয় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

Catherine Beacher এর মতে গৃহই নারীর স্থান। তবে নারীর ক্রিয়াকর্ম আদৌ মূল্যহীন নয়। নারী সংসার গড়ে তোলে, পরিবারকে লালন করে যার মধ্যে মানুষের নৈতিক ধর্মের স্ফুরণ হয়। সংসারের বন্ধন আছে বলেই পুরুষ জাতি কাজ করতে পারে। এই চিন্তাবিদের মতে নারীর গৃহকর্মের জন্যও বুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই দক্ষতা আছে বলেই সমাজে শুচিতা থাকে, সমাজের মানুষ নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে Elizabeth Stanton পুরুষ ও নারীর নীতিবোধের পার্থক্যের কথা বলেছিলেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল যে নারীর নৈতিক মূল্যবোধ পুরুষের নীতিবোধ অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু সমাজ পুরুষের নৈতিকতাকেই সমাজের

নৈতিক আদর্শ বলে প্রচার করেছে। নারীর নীতিবোধকে হয় দমন করা হয়েছে অথবা উপেক্ষা করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নারীকে বাইরের জগতে প্রবেশ করতে দিতে হবে। নারী শুধুই তার গৃহকোণের ব্যাক্তিগত জগতে আবদ্ধ থাকবে এবং তার নৈতিক আদর্শ শুধুই এই সীমিত জগৎকে প্রভাবিত করবে— এইরকম পরিস্থিতি কাঙ্ক্ষিত নয়।

আধুনিক নারীবাদীদের মধ্যে Carol Gilligan এবং Nel Noddings মনে করেন যে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নারীত্বের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ধর্মকে তুচ্ছ করা হয়েছে। এর জন্য ফ্রয়েডকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। ফ্রয়েডই বলেছিলেন যে একমাত্র পুরুষেরই নৈতিক মূল্যবোধ আছে, নারীদের তা নেই। ফ্রয়েড নারীদের নৈতিক দিক থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেছিলেন। Gilligan-এর মতে নারী ও পুরুষের নৈতিকতার তুলনা করা অর্থহীন। যা সত্য তা এই যে নারীর নৈতিকতা বোধ পুরুষের নৈতিকতাবোধ থেকে ভিন্ন। দীর্ঘ সমীক্ষার শেষে তিনি দেখেছেন যে নারীর নীতিবোধের মধ্যে আছে মমতা, যত্ন ও দায়িত্ববোধ যা পুরুষের নীতিবোধের মধ্যে অপ্রাপ্য। নারীর নীতিদর্শন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উপেক্ষা করে না। নারীর নীতিবোধ তিনটি পর্যায়ে ক্রমবিকশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে নারী নিজের স্বার্থকে দেখে; দ্বিতীয় পর্যায়ে সে অপরের স্বার্থচিন্তা করে; তৃতীয় পর্যায়ে সে নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে। নারী মনে করে যে অন্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে সে এমন একটি সত্তায় পরিণত হয় যে সত্তার কাছে তাই নীতিগতবাদে ভালো বলে মনে হয় যা নিজের ও অন্যান্য সমষ্টিবদ্ধ সত্তার পক্ষে ভালো।

আধুনিক যুগে নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তার নাম সিমোঁ দ্য ব্যুভোয়া (Simone de Bouvoir)। তিনি তাঁর 'The Second Sex' নামক গ্রন্থে নারীবাদকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন। সমাজে নারীর পরিচয় এই যে সে পুরুষ নয়। একমাত্র পুরুষই স্বসত্তা বা self, কারণ পুরুষ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী; সে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। নারী যেন পুরুষের তুলনায় পরসত্তা বা other, কারণ নারী পুরুষ নয়। পরসত্তার ধর্ম পরাধীনতা। পুরুষের কাছে নারী যেন একটি বস্তু যাকে সে অবদমন করতে পারে। পুঁজিপতিরা সর্বহারাদের, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের এইভাবে পরসত্তা হিসাবে দেখেছে এবং তাদের নির্যাতন করেছে। পরসত্তা রূপে নারীও পুরুষদের হাতে একইভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

কিন্তু নারী কেন পরসত্তা থেকে স্বসত্তায় উন্নীত হতে পারছে না? ব্যুভোয়া স্বীকার করেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈবিক পার্থক্য আছে। নারীর মাতৃত্ব, তার সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব তাকে স্বসত্তা হয়ে উঠতে দেয়নি। শারীরিক দুর্বলতাও তার স্বসত্তা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নারীর এই